যুগান্তর

তারিখ ... 18 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 6 ...

বিমল সরকার

শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষবিমুখতা বাড়ছে কেন?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ বিমুখতার বিষয়টি সংক্রামক ব্যাধির মতো যেভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে, এদিকে এখনই সঠিকভাবে দৃষ্টি না দিলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর জন্য দায়ী কে— এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই এ বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে যেমন-তেমন, এর ওপরের স্তরগুলোর হালহকিকত একেবারেই নাজুক। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এমনকি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও সত্য যে, বছরের কোনোদিনই একটি ক্লাসেও উপস্থিত না থেকে কিংবা নামকাওয়াস্তে দুই-চার দিন উপস্থিত থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্সের মতো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। অনিয়মিত নয়, ক্লাসে উপস্থিত না হওয়াদের নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবেই বছর বছর এ সুযোগটি করে দিয়ে চলেছে কর্তৃপক্ষ। আর অতি সহজেই সুযোগ পেতে পেতে শিক্ষার্থীদের মাঝে এরূপ ক্লাস না করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা শিক্ষার সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নন, তাদের বোধকরি সহজে বিশ্বাসই করানো যাবে না।

ডিগ্রি পাস কোর্সের মেয়াদ এখন তিন বছর। সেমিস্টার পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষে (চূড়ান্ত) পৃথকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করতে হয়। লক্ষ করার বিষয়, অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ৫০ ভাগ, ৪০ ভাগ, ২৫ ভাগ, এমনকি শাখা বা বিষয় বিশেষে ১০ ভাগ শিক্ষার্থীও ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। কলেজে কলেজে এবং কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা সব শাখার ক্ষেত্রেই বলতে গেলে একই পরিস্থিতি। আর বিজ্ঞান শাখায় তো শিক্ষার্থী এমনিতেই কমছে দিন দিন। শহর ও মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুব একটা আলাদা করা যাবে না। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। শিক্ষার্থীদের যে ক্ষুদ্র অংশটিকে শিক্ষকরা ক্লাসে পান তা কেবল প্রথম বর্ষেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা চূড়ান্ত বর্ষে নৈবচ নৈবচ। এদিক থেকে দর্শনই হোক আর ইতিহাসই হোক অথবা ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান— সবকিছুই যেন একাকার। যার যার রুটিন অনুযায়ী হাজিরা খাতা এবং চক-ডাস্টার হাতে ক্লাসে গিয়ে কোনো শিক্ষার্থীর সন্ধান না পেয়ে যথারীতি ফিরে আসার দুঃসহ বিড়ম্বনাময় অভিজ্ঞতা নেই এমন শিক্ষক খুঁজে পাওয়াটা আসলেই বোধকরি দুষ্কর হবে। শিক্ষকদের এমন অভিজ্ঞতা এক দিন-দুই দিনের নয়। লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এছাড়া একটি ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদি ১০০ থেকে ১৫০ কিংবা ২০০ থাকে আর শিক্ষক পড়াতে গিয়ে ক্লাসে পান মাত্র ১০ থেকে ১২ কিংবা ১৫ জনকে, তাহলে এটাকে কী বলা যাবে? শিক্ষকদের আরও একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিড়ম্বনা হল, আজ যে শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ ভাগ শিক্ষার্থীকে ক্লাসে পেলেন, আগামী ক্লাসে আর ওদের সবাইকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপস্থিতির হার হয়তো একই থাকবে, কিংবা একটু এদিক-সেদিক, কেবল নতুন ও পুরনো মুখের আংশিক অদলবদল। এ অবস্থায় বিষয়ভিত্তিক কোর্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়াতে যাওয়াও এক মহাবিড়ম্বনা।

নতুন আর পুরনো মুখের অদলবদলে যে ক'জন শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত থাকে তারা কি আসলে শিখতে আসে? আমার তা মনে হয় না। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য থাকে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে তথাকথিত একটি সাজেশন আদায় করা। সাজেশন আদায় হয়ে গেল ক্লাসে উপস্থিতির হার আরও কমে যায়। শিক্ষকের দেয়া সাজেশন আর গাইড বই দেখে দেখে প্রশ্ন ও উত্তর মেলানো— এই করতে করতেই বছর শেষ। তবুও রক্ষা, নিয়ম অনুযায়ী এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজে বসে পরীক্ষা দিতে হয়। তা না করে আগের মতো নিজেদের কলেজেই বসে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকলে পরীক্ষার হলে এমন সব পরীক্ষার্থীর দেখা পাওয়া যেত যাদের ক্লাসে তো দূরের কথা, শিক্ষকরা ক্যাম্পাসেই কখনও দেখেননি।

বিষয়টি নিয়ে বড় পরিসরে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে পারে। কেবল আইনকানুন দিয়ে তো কিছুই হয় না, যদি এর যথাযথ প্রয়োগ না থাকে। পাকিস্তান আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কলেজিয়েট, নন-কলেজিয়েট ও ডিস-কলেজিয়েট শব্দগুলো খুবই শোনা যেত। নন-কলেজিয়েট ও ডিস-কলেজিয়েট হিসেবে অনেককেই মাশুল দিতে হয়েছে। এ ধরনের বিধান এখনও রয়েছে, তবে তা নামমাত্র; কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ।

কেবল পাসকোর্স নয়, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের অবস্থাও বলতে গেলে একই রকম। শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিতি, চরম অমনোযোগিতা এবং গাইড বইয়ের তত্ত্ব-তালাশ। গাইড বই-ই শিক্ষার্থীদের ভরসা। বলা যায় একমাত্র অবলম্বন। মাধ্যমিক স্কুল এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মতোই ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষার্থীদেরও হাতে হাতে [illegible] গাইড বই কিনতে, হাতে রাখতে কিংবা হাতে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে কারও কোনো সংকোচ নেই। মূল বই কেনা ও পড়ার কোনো আগ্রহই নেই তাদের। কালেভদ্রে ক্লাসে ঢুকলে শিক্ষার্থীরা গাইড বইয়ের সঙ্গে শিক্ষকের দেয়া বক্তৃতা মিলিয়ে দেখে কোনটি অধিকতর বোধগম্য। গাইড বইয়ের বাইরে যে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বা লেখকের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ বই রয়েছে বা থাকতে পারে, এ সম্পর্কে বেশিরভাগেরই কোনো ধারণা নেই। ধারণা থাকবে বা এ ব্যাপারে কেবল শিক্ষার্থীদেরই বা দোষ দেয়া যাবে কীভাবে। মূল বই বাজারে পাওয়া গেলে তো সে কিনবে! কেবল জেলা সদর নয়, উপজেলা পর্যায়েরও অনেক প্রতিষ্ঠানে এখন ডিগ্রি পাস, অনার্স, এমনকি মাস্টার্স কোর্স পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু থাকলে কী হবে; এসব কোর্সের মোটামুটি উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের মূল বই কয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কিংবা আদৌ পাওয়া যাবে কি-না সেটাই প্রশ্ন। কদাচিৎ যদি কোনো কৌতূহলী শিক্ষার্থী 'যে কোনো লেখকের' একটিমাত্র মূল বই কিনতে আগ্রহী হয়, তাহলে খুঁজতে খুঁজতে সে একেবারে সারা।

এখানে আরেকটি কথা বলা বোধকরি প্রাসঙ্গিক। মান-নির্বিশেষে বিষয়ভিত্তিক অসংখ্য গাইড বইয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে কেবল শিক্ষার্থী নয়, অনেক শিক্ষকও বলতে গেলে দিশেহারা। অনেকে আছেন এবং সংখ্যাটি নিতান্ত কম হবে না, যারা প্রধানত গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করে শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তর অতিক্রম করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা শিক্ষার্থীদেরও গাইড কিনে পড়তে বেশি উৎসাহিত করেন। গাইড বইয়ের দৌরাত্ম্য, শিক্ষার্থীদের অনীহা এবং লেখাপড়ার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বনামখ্যাত লেখক ও শিক্ষকরা মূল বই লেখার ব্যাপারে ক্রমেই যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ বিমুখতার কারণ অনুসন্ধান, এর বাস্তব চিত্র এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণের কাজটি সহজ নয়। আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে তো সম্ভব নয়-ই। বিষয়টি নিয়ে বড় পরিসরে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে পারে। কেবল আইনকানুন দিয়ে তো কিছুই হয় না, যদি এর যথাযথ প্রয়োগ না থাকে। পাকিস্তান আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কলেজিয়েট, নন-কলেজিয়েট ও ডিস-কলেজিয়েট শব্দগুলো খুবই শোনা যেত। নন-কলেজিয়েট ও ডিস-কলেজিয়েট হিসেবে অনেককেই মাশুল দিতে হয়েছে। এ ধরনের বিধান এখনও রয়েছে, তবে তা নামমাত্র; কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ।

স্বীকার করতেই হবে— বই, লেখাপড়া ও শ্রেণীকক্ষবিমুখ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা আজকাল পরীক্ষায় অনেক ভালো ফল করছে। অবশ্য এ নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। আমরা চাই সর্বস্তরেই শিক্ষার্থীরা যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। ধাপে ধাপে অর্জন করা সার্টিফিকেটগুলো কোনোক্রমেই যাতে শিক্ষার্থী অথবা তার পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়।

বিমল সরকার : সহকারী অধ্যাপক